# ‘জ্যান্ত দুর্গা’

প্রব্রাজিকা বিদ্যাত্মপ্রাণা

একদিকে মহাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনার সময় আগত, আর অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী মহামারি-ক্লিষ্ট সংকটময় পরিস্থিতি। কল্যাণী মায়ের এ কী রুদ্রাণী রূপ! মনে পড়ে যায় প্রেমানন্দ মহারাজের কথা—‘‘আমরা মাটির খেলনা নিয়ে মেতে আছি। কামিনী-কাঞ্চন, মান-ইজ্জত পেয়ে সব বিস্মরণ! তাই কৃপানিধান দয়া করে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে বহুজনহিতায় আনেন।’’[১]

মহাশক্তি একইসঙ্গে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করে থাকেন। দশমহাবিদ্যারূপ তারই দ্যোতক। এই প্রত্যেকটি রূপের আবির্ভাবের সময়, প্রেক্ষাপট ও কার্যাবলি যেমন আলাদা, তেমনি জগতে যখনই শক্তি আবির্ভূত হয়েছেন তখনই সে-আবির্ভাবের পরিস্থিতি ও কার্য ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আবির্ভাবের কারণটি কিন্তু একই রয়ে গেছে—অসুরনিধন ও শুভকার্যের উদ্বোধন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মেধা ঋষি মহামায়ার বিশেষরূপ ধরে জগতে আবির্ভাবের কারণ বর্ণনা করেছেন—

‘‘দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যথা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥’’

—তিনি যদিও নিত্যা এবং জন্মমৃত্যুরহিতা, তবুও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি প্রকট হন।

‘দেবতাদের কার্যসিদ্ধি’ কথাটি অত্যন্ত অর্থবহ। এখানে একইসঙ্গে দুটি দিক নির্দেশ করা হচ্ছে—অসুরনিধন আর আসুরিক প্রবৃত্তির বিনাশ করে দেবত্বের প্রকাশ। সেজন্য বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত সবেতেই কোনও শুভকাজে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে শক্তি আরাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। শক্তির বিভিন্ন রূপের মধ্যে দুর্গারূপটি অন্যতম। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাসূক্তে দেবী দুর্গার কথা পাওয়া যায় : ‘‘তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং/ বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।/দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে/ সুতরসি তরসে নমঃ॥’’—‘‘আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পরিদৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদগ্ধকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে সুতারিণী, হে সংসারত্রাণকারিণী দেবি, তোমাকে প্রণাম করি।’’

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাওয়া যায়, ‘‘প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেণ পরমাত্মনা।/ বৃন্দাবনে...’’ অর্থাৎ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে প্রথম আবাহন করে পূজা করেছিলেন।[২] এখানে দেবী শব্দে হয়তো কাত্যায়নী দেবীকে বোঝানো হয়েছে, যিনি পরে দুর্গারূপে পরিচিত হয়েছিলেন। দেবীর দ্বিতীয়বার পূজা করেন

'মধুকৈটভভীত' ব্রহ্মা। ত্রিপুরাসুর বধের সময় দেবী তৃতীয়বার মহাদেব কর্তৃক পূজিতা হন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুর নাশ করে বিশ্বের পূর্বশ্রী ফিরিয়ে আনার জন্য ভগবতীর অর্চনা করেছিলেন।[৩]

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরুর আগে যুদ্ধজয়ের জন্য অর্জুনকে দুর্গাস্তব করতে উপদেশ দেন—''পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরথ।''[৪] কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসারে, ব্রহ্মা রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রকে দেবী দুর্গার পূজা করতে বলেছিলেন, ''অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী/ তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার।''[৫]

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে অসুরবধ করেছেন, মহাভারত এবং রামায়ণে অসুরবধে সহায়তা করেছেন। এযুগে শ্রীশ্রীমা সারদারূপে তিনি একইসঙ্গে অসুরবিনাশিনী আবার শ্রীরামকৃষ্ণের নব যুগধর্মপ্রবর্তনের সহায়কারিণী। এ এক অপূর্ব লীলা। তাঁর দেবীরূপের উদ্বোধন করেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। যে-বিশেষ ভাবপ্রচারের জন্য এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ, তার প্রস্তুতিপর্বে তিনি শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের আরাধনা করে তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। জগতের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

মায়ের এই মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীশ্রীমা ছিলেন তাঁর কাছে 'জ্যান্ত দুর্গা'। বেদ, পুরাণ, মহাকাব্যের বাণীর অনুরণন শোনা যায় স্বামীজীর মুখেও। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে গুরুভাই শিবানন্দজীকে তিনি লিখেছেন, ''তাঁর (শ্রীশ্রীমায়ের) মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে!" আরও লিখেছেন, ''যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে মাতৃভাবে পূজা করবে তাদের কী কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে।... দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।" তার পরের পঙ্‌ক্তি : ''বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে, সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে—। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি; তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি।' "

'শক্তির কৃপা'ই কার্যসিদ্ধির মূল কারণ, আর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার—যা সঙ্ঘের ব্রত—তার জন্য শ্রীশ্রীমারূপী জ্যান্ত দুর্গার আরাধনা প্রয়োজন—একথা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে স্বামীজীই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন।

ভারতবর্ষের তৎকালীন সামাজিক ও অন্যান্য বিবিধ কারণের জন্য স্বামীজীর এই অভিনব দুর্গোৎসবটি হতে আরও ষাট বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে গঙ্গার পূর্বতীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বামীজীর বহু অভীপ্সিত স্বাধীন স্ত্রীমঠ—শ্রীসারদা মঠ।

স্বামীজী স্থূলদেহে থাকতে মেয়েদের মঠ স্থাপিত না হলেও, বেলুড়ে সাধুদের মঠের জন্য জমি কিনে 'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে দুর্গোৎসব করা সম্ভব হয়েছিল। মঠের এই প্রথম দুর্গোৎসবেই স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন, এরপর তিনি মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন। দুর্গাপূজা সার্থকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করে স্বামীজী পূজার কয়েকদিন পাশে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন।[৬] পূজায় স্বামীজীর নির্দেশে

শ্রীশ্রীমায়ের নামে সংকল্প করা হয়।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার মাধ্যমে শক্তি আরাধনার ধারাটি অব্যাহত থাক, এই ছিল শক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা। একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। একবার স্বামী শিবানন্দ মহারাজ (মহাপুরুষ মহারাজ) স্থির করেন মঠে দুর্গাপূজা হবে না। প্রেমানন্দজী তখন অসুস্থ হয়ে বলরাম মন্দিরে ছিলেন। দুজন বিশিষ্ট ভক্ত তাঁকে গিয়ে বলেন, ''মহারাজ এবার মঠে দুর্গাপূজা করবার খুব আগ্রহ নিয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, এবার আর মঠে পূজা হবে না।'' বাবুরাম মহারাজ তাঁদের পরামর্শ দিলেন, ''তোরা এক কাজ কর। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উদ্বোধনে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে পূজা করবার ইচ্ছা প্রকাশ কর। তিনি কি বলেন দেখ্।'' মায়ের কাছে গিয়ে সব বলতে তিনি বললেন, ''মা দুর্গা যদি নিজের ইচ্ছায় আসেন, তবে আমাদের হ্যাঁ, না করার কি আছে?'' ভক্ত দুটি তখনই বেলুড় মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে শ্রীমায়ের কথা বললেন। তিনি সেকথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, ''মা বলেছেন, তাহলে পুজো হবে।'' বলাবাহুল্য সেবার যথারীতি মঠে দুর্গাপূজা হল। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, ''এরপর থেকে মহাপুরুষ মহারাজেরও দুর্গাপূজার ওপর একটা অদ্ভুত আগ্রহ দেখেছি। তারপর থেকে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দুর্গাপূজা করেছেন এবং স্থায়ীভাবে দুর্গাপূজার ব্যবস্থাও করেছেন শুনেছি।''

১৯১২ সাল। ষষ্ঠীর দিন মঠের ফটকে মায়ের গাড়ি এসে থেমেছে। ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে প্রেমানন্দজী ও অন্যান্য ভক্তেরা গাড়ি টেনে মঠে নিয়ে আসছেন। প্রেমানন্দজী আনন্দে টলছেন—চোখমুখ দিয়ে আনন্দ ঠিকরে পড়ছে। মহানবমীর দিন দুপুরের পর গোলাপ মা এসে বললেন, ''শরৎ, মা ঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুশি, তোমাদের তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।'' শরৎ মহারাজ আনন্দগম্ভীর কণ্ঠে 'বটে?' বলে পাশে উপবিষ্ট বাবুরাম মহারাজের দিকে চেয়ে বললেন, 'বাবুরামদা, শুনলে?' আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুই দিকপাল আনন্দে কোলাকুলি করতে লাগলেন। এত আয়োজন করে দুর্গাপূজা করা সার্থক হয়েছে—শ্রীশ্রীমা যখন তুষ্ট, জগন্মাতা দুর্গাও তখন প্রসন্না। শ্রীশ্রীমা-ই যে স্বয়ং দুর্গা!

মহিষাসুরমর্দিনীরূপের অন্তরালে থাকে সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের মঙ্গলকামনা। দেবী যে মহিষাসুর বধ করে একইসঙ্গে জগৎ রক্ষা ও মহিষাসুরকে উদ্ধার—দুটি কাজই সম্পন্ন করেছিলেন, তার বর্ণনা রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবে—

''এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥''

—দেবী, এই অসুরগণ নিহত হলে জগতে শান্তি বিরাজ করবে এবং এরা নরকগমনের মতো জঘন্য পাপ করলেও আপনার সঙ্গে সম্মুখসংগ্রামে মৃত্যুলাভ করে দিব্যলোকে গমন করবে—এই কথা মনে করেই আপনি অনিষ্টকারী অসুরদের বধ করতে প্রবৃত্ত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে অভিহিত করেছিলেন, তখন মায়ের আপাত শান্তমূর্তির অন্তরালে যে-ভয়ংকরী অথচ কল্যাণকারিণী মাতৃমূর্তি প্রচ্ছন্ন, তার পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জনৈক ভক্ত স্বামীজীর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁর থেকে বড় কেউ তাঁর গুরু হবেন। এরপরে ওই ভক্ত স্বপ্নে এক দেবীমূর্তির কাছে দীক্ষালাভ করেন। সেই দেবী স্বপ্নে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন, ''আমি সরস্বতী।'' স্বামীজীকে

স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালে তিনি তাঁকে বলেন, ‘‘ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক্, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।... উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহারমূর্তি; সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।’’ পরবর্তী কালে ভক্তটি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষালাভ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। দীক্ষার সময়ে তিনি দেখেন স্বপ্নে দৃষ্ট দেবীই শ্রীশ্রীমা।[৭]

এক দরিদ্র মহিলার ওপর স্বামীর অত্যাচার, সিন্ধুবালা দেবীকে পুলিশের নিগ্রহ, বিকৃতমস্তিষ্ক হরিশের অন্যায় আচরণ ইত্যাদি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মায়ের ওই সংহারমূর্তি ক্ষণিকের জন্য প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই সংহারমূর্তিও শ্রীশ্রীচণ্ডীর বর্ণনা অনুযায়ী সন্তানের মঙ্গলের জন্য। বর্তমানে মহিষাসুরমর্দিনী তিনি কিন্তু নবরূপে, নবভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূতা।

শ্রীমা সারদার সময়ে সমাজ নানা প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে বেষ্টিত। সমাজসংস্কারকরা চেষ্টা করছেন পৃথকপৃথকভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করতে। সমস্যার সংখ্যা একাধিক হলেও আদতে তা একটি সমস্যারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। মা যদি মহিষাসুরমর্দিনী হয়ে থাকেন, তবে সমস্যাগুলি যেন একই মহিষাসুরের বিভিন্ন রূপ। দেবীর হাতে নিজের সৈন্যনাশ হতে দেখে মহিষাসুর প্রথমে মহিষ, তারপর যথাক্রমে সিংহ, খড়্গধারী পুরুষ, হাতি ও সবশেষে আবার মহিষরূপ ধারণ করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এক্ষেত্রে মহিষাসুররূপী সেই মূল সমস্যাটি কী? সেটি হল, অমৃতের পুত্র মানুষের মধ্যেই যে দেবত্ব নিহিত—এই সত্যকে সে ভুলতে বসেছিল, তাই জাতিভেদপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, কৌলীন্যের আত্মশ্লাঘা, নারীজাতির অবমাননা, ধর্মের রীতিনীতির নামে কুসংস্কার ও অত্যাচার চরমে উঠেছিল। মা তাঁর জীবন দিয়ে, আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, সব মানুষের ভেতরই সেই একই চৈতন্যের প্রকাশ। তিনি এযুগে প্রকৃত অর্থেই অসুরভাব বিনাশ করে, শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’ এই বাণীকে রূপায়িত করে গেছেন।

প্রথমেই আসা যাক সমাজের কুসংস্কার ও গোঁড়ামির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীমায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে। সেসময় যেসব হিন্দু ‘কালাপানি’ পেরোতেন অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রা করতেন, দেশে ফিরে আসার পরেই তাঁদের একঘরে করা হত। সমসাময়িক সমাজের বিশিষ্ট মানুষ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সন্ন্যাসীর ম্লেচ্ছদেশে যাওয়া অনুমোদন করেননি। শ্রীশ্রীমা কিন্তু নির্দ্বিধায় স্বামীজীকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন—সেযুগের পটভূমিতে এই সিদ্ধান্ত সত্যিই দৃষ্টান্ত।

সেযুগে বিধবা নারীদের ওপর সমাজ যে-সমস্ত

কঠিন নিয়ম আরোপ করেছিল, শ্রীশ্রীমা তার সবকিছু সমর্থন করেননি। একাদশীতে নির্জলা উপবাস ইত্যাদি অতিরিক্ত কঠোরতা করে শরীরপাত করতে তিনি নিষেধ করেছিলেন। সমাজের আরোপিত নিয়মকানুন কতটা গ্রহণযোগ্য সে-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের সহজ কিন্তু যুক্তিপূর্ণ, বুদ্ধিগ্রাহ্য সমাধান—''খুঁটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না;... যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তা-ই করবে।''

সমাজের জাতপাত-অস্পৃশ্যতার বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন শ্রীশ্রীমা। অব্রাহ্মণ ভক্তসন্তানদের উচ্ছিষ্ট তিনি নিজের হাতে পরিষ্কার করেছেন। জাতপাত-নির্বিশেষে ভক্তসন্তানদের একসঙ্গে বসিয়ে মুড়ি-জিলিপি খাইয়ে আনন্দ করেছেন। জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যও তাঁকে কম কষ্ট পেতে হয়নি। গ্রামের ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, ব্রাহ্মণ জমিদাররা তাঁকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন, সঙ্গিনী গোলাপ-মা, নলিনীদিদি প্রমুখ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মা কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অচল, অটল থেকে গেছেন।

মা তাঁর ভাইঝি রাধুকে এক কায়স্থ চিকিৎসককে প্রণাম করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। এতে কেউ কেউ আপত্তি করেন কারণ রাধু ব্রাহ্মণকন্যা। মা কিন্তু উত্তরে বলেন, ''তা করবে না? কতবড় বিজ্ঞ! ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে? '' এই ছোট্ট ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয়, মার কাছে জাতিগত উৎকর্ষের থেকে অনেক বড় ছিল গুণগত উৎকর্ষ।

মনে রাখতে হবে, এই একই সামাজিক পরিবেশে লালিত হয়েও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনে কোনও অব্রাহ্মণকে পায়ে হাত দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রণাম করা উচিত কি না—সেবিষয়ে সন্দেহ ছিল।

রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বিধবা হয়েও মা মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড ও সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে একত্রে আহার করেছিলেন। এই উদারতায় স্বামীজী পর্যন্ত বিস্মিত হন। মায়ের এ-আচরণের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। নিবেদিতা লিখেছেন, ''এর দ্বারা আমরা জাতে উঠেছি, এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে, যা অন্য কিছুতেই হতে পারত না।''

সমসাময়িক আরও একটি ঘটনার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে মায়ের এই আচরণের মহত্ত্ব কতখানি। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারিদের আয়োজিত এক সভায় নিমন্ত্রিত হন ভারতের নবজাগরণ আন্দোলনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি—বালগঙ্গাধর তিলক এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। খ্রিস্টানদের সঙ্গে খাওয়ার অপরাধে দুজনকেই পরে সমাজপতিদের নির্দেশে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।[৮]

জয়রামবাটীর কাছে শিরোমণিপুরের মুসলমানদের অধিকাংশই ছিল তুঁতচাষী। পরাধীন ভারতে রেশম ব্যবসায় বিদেশি প্রযুক্তির কাছে দেশীয় প্রযুক্তি পরাজিত হওয়াতে তারা তুঁতচাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নিরুপায় তুঁতচাষীরা সংসার নির্বাহের জন্য বাধ্য হয়ে চুরি-ডাকাতি শুরু করে। শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাদের এই নীচ বৃত্তির জন্য কখনও ঘৃণা করেননি। বরাবর তাদের মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। এমনই এক জেলফেরত তুঁতচাষী আমজাদকে তিনি তাঁর সন্ন্যাসী সেবক সারদানন্দ মহারাজের মতো সমান মর্যাদা দিয়ে বলেছেন, ''আমার শরৎও যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।'' ব্রাহ্মণের বিধবা হয়েও তিনি আমজাদকে নিজের হাতে পরিবেশন করেছেন, তার উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেছেন, তার আনা কলা নির্দ্বিধায় ঠাকুরকে নিবেদন করেছেন।

তাঁর এই আচরণ যে কতটা বৈপ্লবিক সে-সম্বন্ধে ধারণা হয় স্বদেশি আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক দেখে। নেতারা যখন রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেছিলেন, তখন এক হিন্দু স্বদেশি প্রচারক

একগ্লাস জল খাবেন বলে তাঁর মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া থেকে নেমে যেতে বলতে একটুও সংকোচ বোধ করেননি।[৯]

নারীশিক্ষা, নারীদের স্বনির্ভরতা, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে আজও সমাজে প্রচার চালানোর প্রয়োজন দেখা যায়, সারদা দেবী কিন্তু সেই যুগেই এইসব ক্ষেত্রে রীতিমতো অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

মেয়েদের আত্মমর্যাদা এবং সেইসঙ্গে সমাজে তাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। জয়রামবাটী, কোয়ালপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির নিরক্ষর মেয়েদের দেখে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, ''এদেশের মেয়েরা সব পশুর মতো দেখছি। আমার একেক সময় মনে হয় এদের শেখাবার ব্যবস্থা করি।'' এক স্ত্রীভক্ত তাঁর অবিবাহিতা কন্যাদের জন্য দুশ্চিন্তা করলে মা বলেছিলেন, ''বে দিতে না পারো এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও, লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।'' তাঁর ভাইঝি রাধু চোদ্দো বছর বয়সেও মিশনারি স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করত, যা সেযুগের গোঁড়া হিন্দুসমাজের চোখে ছিল অত্যন্ত নিন্দনীয়। গৌরীমা সারদেশ্বরী আশ্রমের আশ্রমিকাদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্না শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাঁকে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেন। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পরা-অপরা দুই বিদ্যারই চর্চার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন।

ব্রাহ্মণকন্যা পারুল (পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) যাতে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সেজন্য মিশনারি পরিচালিত হাসপাতালে থেকে তাঁর ধাত্রীবিদ্যা শেখার প্রস্তাব শ্রীশ্রীমা অনুমোদন করেছিলেন অন্যদের আপত্তি উপেক্ষা করে।

মেয়েদের ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস অবলম্বন করে স্বাধীন জীবনযাপনকে তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। পারুল যখন সুধীরা দেবীর প্রেরণায় গৃহত্যাগ করে ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে আশ্রমজীবন যাপন করবেন বলে চলে আসেন, তখন তাঁর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং নিবেদিতা 'সীতা-সাবিত্রীর দেশ ভারতবর্ষে' একটি বিবাহিতা মেয়ের এই আচরণ সমর্থন করেননি, কিন্তু শ্রীশ্রীমা এতে অমত করেননি এবং পরবর্তী কালে তাঁকে নিজের আশ্রয়ে রেখে তাঁর সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন।

সমাজের যে-নিয়ম, বিধিনিষেধ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে খর্ব করে, শ্রীশ্রীমা কখনও তাকে সমর্থন করেননি। আরও একটি ঘটনার কথা বললে অনুভব করা যাবে, মা যুগের থেকে কতখানি এগিয়ে ছিলেন, অথবা বলা যেতে পারে, মা নিজে আচরণ করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, কোনটি করা কর্তব্য। সেসময়ে কোনও ভদ্রঘরের মহিলার থিয়েটার দেখতে যাওয়া সমাজে অনুমোদিত ছিল না, কারণ বারাঙ্গনারা থিয়েটারে অভিনয় করতেন। সমাজের চোখে তাঁরা কত ঘৃণ্য ছিলেন সেসময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ''থিয়েটার এখন ভদ্রলোকের যাবার যোগ্যস্থান নয়।'' ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের বক্তব্য—''যদি ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকেরা বেশ্যার অভিনয় দেখে, তাহা হইলে তাহাদের যে কী সর্বনাশ হইবে তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না।'' এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রীশ্রীমা মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়ে অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে কোলে টেনে নিয়ে চুম্বন করে আশীর্বাদ করেছিলেন। অভিনেত্রী তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী প্রায়ই উদ্বোধনে তাঁকে দর্শন করতে যেতেন। সমাজ যাদের হীনদৃষ্টিতে দেখে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তাদের গুণের কদর করতে

শ্রীশ্রীমা একবারও দ্বিধা করেননি, কারণ সেই গুণ যে অন্তর্নিহিত দেবত্বেরই প্রকাশ!

এরকম অগণিত ঘটনার আলোকে আলোকিত শ্রীশ্রীমায়ের জীবন। ঘটনা অজস্র, পরিস্থিতি বিভিন্ন হলেও শ্রীশ্রীমায়ের আচরণের একটিই মূল উদ্দেশ্য—অন্তর্নিহিত দেবত্বের জাগরণ। সমাজের যে-আসুরিক রীতিনীতি এই জাগরণে বাধা দিয়েছে, তিনি তা সমর্থন করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে' তিনি জীবনযাপন করেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে সমাজের স্বার্থান্বেষী রীতিনীতি। সমাজের বিভিন্ন সমস্যায় তথাকথিত প্রগতিশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বহুগুণে বাস্তব, যুক্তিপূর্ণ ও সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানসূত্র দিয়েছেন বাহ্যদৃষ্টিতে অশিক্ষিত অজ পাড়াগাঁয়ের এই মহীয়সী নারী।

'জ্যান্ত দুর্গা' শ্রীশ্রীমায়ের মর্ত্যলীলা সংবরণের পর ঠিক একশো বছর অতিক্রান্ত। যত দিন যাচ্ছে তাঁর জীবন ও বাণী আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে যখন তাঁকে দেখে, তারা অনুভব করে মায়ের কথা, প্রতিটি আচার-আচরণ সবই দেশকালের সীমা অতিক্রম করে আজও সমান যুক্তিপূর্ণ। প্রাচ্যের মানুষ বিশ্বাস করে মায়ের সেই অমোঘ বাণী—''জানবে তোমার একজন মা আছেন।'' মা নিজে বলেছেন, তিনি সতেরও মা, অসতেরও মা। সন্তান যদি ধুলোকাদা মাখে, তবে তার ধুলো ঝেড়ে মাকেই তো কোলে টেনে নিতে হবে। এখন বোধ হয় সেই ধুলো ঝেড়ে শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া চলছে। আজকের এই মহামারির মধ্য দিয়ে মা তাঁর সন্তানদের শেখাচ্ছেন আরও সংযত, অন্তর্মুখ, ঈশ্বরনির্ভর হতে। আমাদের একমাত্র উপায় মাতৃচরণে একান্ত শরণাগতি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অম্বাস্তোত্রে বলেছেন,

''যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ স্বকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা॥''

—যতদিন না আমার সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মা তাঁর মধুর লীলাবিলাসের মধ্য দিয়ে অতি দুঃখময়, যন্ত্রণাময় পথে আমাকে নিয়ে চলেছেন। এই পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে তিনি সবসময় উত্তমরূপে সৎপথে পরিচালিত করছেন। সুতরাং আমি সফল বা বিফল যাই হই না কেন, সেই কল্যাণময়ী মা অম্বাই আমার পরম গতি। ✠

## তথ্যসূত্র


১। স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ, *কথাপ্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৯), পৃঃ ২৪৯

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা,* (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ : কলকাতা, ১৯৯০) পৃঃ ১৫৬ [এরপর, *মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা*]

৩। তদেব, পৃঃ ১৫৭

৪। *মহাভারত,* ভীষ্মপর্ব, ২৩।২

৫। *মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা,* পৃঃ ২৩১

৬। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ১৫৪

৭। সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *শতরূপে সারদা* (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউ অব কালচার : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ২২

৮। তদেব, পৃঃ ৫৩৪

৯। সুস্মিতা ঘোষ, *বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), পৃঃ ১০৫